ভূমিকা

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে সমাজতত্ত্ব

কালের বিচারে সাহিত্যের নবীনতম অথচ সক্ষম ও সুন্দর জাতক ছোটগল্প। উনিশ শতকেই এর জন্ম, বৃদ্ধি ও বিকাশ। এর রূপ ও স্বরূপ সম্পর্কে দেশে ও বিদেশে বহু মূল্যবান আলোচনা হয়েছে। কিন্তু মূলকথা — " বিন্দুতে সিন্ধু, চূড়ামণি-যোগের স্নান মুহূর্ত, ঘটনা-শুক্তিতে শায়িত একটি ক্ষুদ্র নিটোল মুক্তা, ললাট লিপিতে উৎকীর্ণ এক বাক্যের একটি গাঢ়বন্ধ জীবনানুশাসন, চোরালণ্ঠনের আলো, ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথার সরল আলেখ্য, ঘনান্ধকারের বিদ্যুৎ-ঝলক"[১] ইত্যাকার নানান অভিধায় ছোটগল্পের পরিচয় লিপিবদ্ধ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে গল্প লেখক ও পাঠকের মধ্যে ভিন্নরুচি বর্তমান। লেখার ক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীনতা যেমন বর্তমান, তেমনই পাঠকের নিকট সেই গল্প গ্রহণ অথবা বর্জনের স্বাধীনতাও বিদ্যমান। অবশ্য লেখকগণ সর্বদাই সমকালীন জীবনদর্শন এবং মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করায় ঐকান্তিক ভিন্ন স্টাইল-এ। তাই লেখকের লেখায় সমাজের বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন ভঙ্গীতে হয় অভিব্যক্ত ।

বর্তমান আলোচনা যেহেতু সমাজতত্ত্বের নিরিখে তারাশঙ্করের ছোটগল্প, তাই সমাজতত্ত্ব ও সমাজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের অবতারণা এখানে প্রাসঙ্গিক।

একথা সকলেরই জানা যে, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবর্জিত মানুষ হয় দেবতা না হয় পশু। স্বভাবের তাড়নায় কিংবা প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের সমাজ সৃষ্টি। সমাজেই তার জন্ম, বৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা এবং মৃত্যু। রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ইত্যাদি ব্যক্তি-বিশেষে ভিন্ন হলেও কোন মানুষই সমাজ ব্যতিরিক্ত নয়। তাই মানুষের জীবনে সমাজের ভূমিকা আজ অনন্য বলে স্বীকৃত। মানবজীবনে সমাজ-ই বুঝি রাষ্ট্রপুরুষ। অথচ মানুষের মনে 'সমাজ' নামক এই গুরুত্বপূর্ণ চেতনার বিকাশ ঘটেছে কিন্তু বহু বিলম্বে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে প্লেটোর Republic এবং অ্যারিস্টটলের Ethics & Politics গ্রন্থদ্বয়ে প্রসঙ্গ ক্রমে হলেও সমাজ সম্পর্কে প্রথম অবতারণা লক্ষ্য করা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও এর যেমন আভাস মেলে, তেমনই প্রাচ্যের পুরাণ ও বেদেও পূর্ববর্তী পর্যায়ের নজির আছে। কিন্তু সমাজ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, সমাজবদ্ধ মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তাবিদদের ধ্যান-ধারণা ও নবনব তত্ত্ব এবং তথ্যের উদ্ভাবনের পর সমাজ সম্পর্কে ঔৎসুক্য—যার ফলশ্রুতিতে সমাজতত্ত্বের জন্ম। বর্তমানে এর বহু শাখা - প্রশাখা।

সমাজতত্ত্বের মুখ্য আলোচ্য বিষয় সমাজ জীবনে নানা ধরনের সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয় করা। এ প্রসঙ্গে ইউরোপের সমাজজীবন স্মরণীয়। অষ্টাদশ শতকের শিল্প-বিপ্লব আমূল পরিবর্তন এনেছিল ইউরোপের সমাজজীবনে। যেমন - শ্রমিক-মালিক বিরোধ, শ্রমিকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা, গ্রামভিত্তিক সমাজের অবক্ষয়, নগরভিত্তিক সমাজের গুরুত্ব, বৃদ্ধি ইত্যাদি। ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতেও দারিদ্র্য ও সামাজিক সমস্যার সমাধানের প্রয়াস হয় পরিলক্ষিত।

তাছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নাবিকগণের বিভিন্ন দেশে গতায়াতে সেখানকার সামাজিক রীতি-নীতি গ্রহণ এবং তাকে অবলম্বন করেই শুরু হয় ইতিহাস চর্চা। পরবর্তীকালে এই ইতিহাস চর্চা থেকেই সমাজতত্ত্বের সৃষ্টি। সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কেও এক বিশেষ ধারণাজাত হয়। মানুষ স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা কামনা করে এবং যুক্ত হয় নানা জটিল সম্পর্কের জালে। এই পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল জাল-ই 'সমাজ' নামে অভিহিত। সমাজ গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। অধ্যাপক ম্যাকাইভার এবং পেজ বলেছেন, "Society exists only as a time sequence, it is a becoming not a being; a process, not a product."[২] সেইসঙ্গে তাঁরা আরও বলেছেন, যে সমাজ "..... is a system of usages and procedures of authority and mutual aid, of many groupings and divisions of controls of human behaviour and liberties."[৩] আবার Giddings সমাজকে বৈজ্ঞানিক অর্থে বলেছেন, "..... a society is naturally developing group of conscious beings, in which converse passes into definite relationships that, in course of time, are wrought into complex and enduring organization"[৪]

সুতরাং অনুমান করা যায় যে, সমাজস্থ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক খুবই জটিল। এ ধরণের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল জাল-ই হল 'সমাজ'। যে শাস্ত্র মানুষের যাবতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক, তার সাংগঠনিক প্রকাশ, কর্মপ্রণালী ও সমস্যার বিশ্লেষণ করে তাই-ই সমাজবিদ্যা।

লেখকমনের সমাজ, জীবন, কল্পনা, রূপ ইত্যাকার বোধ থেকেই সৃষ্টি হয় সাহিত্য। লেখক ও পাঠক উভয়েই

উপরিউক্ত উপাদান প্রাপ্তির প্রত্যাশী। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে পাঠকশ্রেণী দুভাগে বিভক্ত— (১) প্রথম শ্রেণীর নিকট সামাজিক সত্যের চিত্রই প্রধান বলে সাহিত্যের মূল্য। (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকেরা বহুভোগে তৃপ্তির প্রত্যাশী। শিল্পের ভোগে তাঁরা চিত্ত-সরসে ঐকান্তিক এবং সেই সঙ্গে জীবনরসপানেও তাঁদের আর্তি। আর এই ভোগের সঙ্গে মননের আত্মীয়তার মধ্যে সমাজের নানা প্রসঙ্গ জমা হয়। মোট কথা, সমাজ (সামাজিক পরিস্থিতি এবং শ্রেণীবিন্যাস), পরিবার (পারিবারিক কাঠামো), ঐতিহ্য, আচরণবিধি, সাংস্কৃতি-মান এবং অন্য একটি বৈশিষ্ট্য (মোট ব্যক্তিগত, মনস্তাত্ত্বিক জানা-অজানা নানা ঘটনা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অন্তরে লালিত ও পল্লবিত হয়)— এগুলির সমবায়ে সৃষ্টি হয় সাহিত্যিকের মন।

সাহিত্যে যে সমাজ, রাজনীতি, প্রগতি ইত্যাদির অনিবার্য প্রভাব পড়ে তার প্রমাণের জন্যে এসেছে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে অর্থনৈতিক বিন্যাস এবং উপাদান সম্পর্ক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে সমাজব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটে যা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামে পরিচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাস নির্দেশিত পথে সমাজকে বদলাতে চায়। তাই এই মতাবলম্বীগণ মনে করেন যে সাহিত্যে আর্থ-সামাজিক পটভূমির প্রতিফলন বিশ্লেষণ যেমন জরুরী, তেমনই সাহিত্যে যে সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার বিচারও প্রয়োজন। এপ্রসঙ্গে ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন, "লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতায় বিশ্বাস মার্কসবাদী সাহিত্য ভাবনার একটি বিশিষ্ট দিক।"[৫] তিনি আরও বলেছেন, "মার্কসবাদই একমাত্রবিদ্যা যাতে দীক্ষা নিলে ঐ সম্বন্ধের গোলকধাঁধায় প্রবেশ নিষ্ক্রমণের আলো নিজের দৃষ্টিতে অনুভব করা যায়। এবং একথাও মনে রাখি মার্কসীয় জ্ঞানমার্গ একটি মৌল দৃষ্টিকোণ তা অন্য বিদ্যার ঘাতক নয়, সাহিত্য শিল্প সাধনার নিজস্ব ভূমিতে সে আগ্রাসী নয়, যতটা সম্ভব তাকেও পুষ্ট হতে সাহায্য করে। কিন্তু প্রায়ই যান্ত্রিক প্রয়োগে ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় এই বিদ্যার সুযোগটুকু স্খলিত হয়ে পড়ে।"[৬] প্রাজ্ঞ মার্কসবাদী সমালোচকের বক্তব্যের শেষাংশে যে বিপদের সংকেত আছে, দুর্ভাগ্যের বিষয় সেটিই আজ বেশী লক্ষণীয়।

বাংলা ছোট গল্পের প্রকৃত যাত্রা রবীন্দ্রনাথ থেকেই। তাঁর অসংখ্য গল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর জীবিকার নর-নারীরা হাজির হয়েছে, যাদের সঙ্গে সামাজিক বিকাশের ধারা নিগূঢ়ভাবে অন্বিত। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতেও সমাজের সেইসব ব্রাত্য শোষিত শ্রেণীর প্রাত্যহিক সমাজ জীবনালেখ্য বিধৃত। তবে উপন্যাসে যা তখনও সম্ভব হয়নি, ছোটগল্পের নিগড়ে তা কিন্তু বাঁধা পড়তে শুরু করেছে। আসলে ছোটগল্প বলেই হয়ত তা করা সম্ভব হয়েছে। শুধু নিম্ন কোটির মানুষ বলেই নয়, বিচিত্র বৃত্তির এবং বৃত্তিহীন মানুষের কথা এই পথেই, এইভাবেই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। এমনসব তুচ্ছ, গুরুত্বহীন মানুষের মিছিল ছোটগল্পে আছে—যাদের সমস্যা বৃহৎ নয়, জটিল নয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমাজ বিন্যাসে এবং জীবনে প্রসারিত সত্য-ছবিকে চিনে নেওয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। এবং এদের নিয়েই উপন্যাস রচনায় বানিয়ে তোলার কথায় বিস্তারে বাস্তবতা চাপা পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ছোটগল্পে চকিতে দীপ্ত হয়ে একটা চূড়ান্ত মুহূর্তে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে। মূল্যবোধের অবসান, হতাশা ও মানসিক বিপর্যয়, পারিবারিক ভাঙ্গন, দারিদ্র্যের পীড়ন, নেতিবাচক সংশয়, উদভ্রান্ত বিহ্বলতা, ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদ, বেকারত্ব প্রভৃতি কারণে এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পর সমাজ জীবনে তথা ব্যক্তি জীবনে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে, তার বাস্তব চিত্র তথা সমাজচিত্র ছোটগল্পে চিত্রিত করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

অবশ্য শুধুমাত্র আপাতদৃষ্ট সমাজচিত্রই নয়, সমাজজীবনে দ্বিধাদীর্ণ রূপ, তার হরেক রকম চিত্র-চরিত্র, মূল্যবোধ, মনোবিকলন, মানসিক বিকার— বিকৃতির আদিম রিরংসার অশ্রুতপূর্ব রূপও বিধৃত হয়েছে এই সমাজতত্ত্বের বিশাল ক্যানভাসে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কল্লোলগোষ্ঠী তথা 'কল্লোল যুগ' নতুন একটি বিশিষ্ট পর্ব অধ্যায় সংযোজন করেছে। নতুন আদর্শ প্রবর্তনের তাগিদেই তার যাত্রা। বাস্তববাদের পথে এই গোষ্ঠীর লেখকদের যাত্রা বলেই 'কল্লোল' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

কিন্তু "কল্লোল যুগ" নিজেদের বস্তুবাদী বলে দাবী করলেও মূলতঃ সে গোষ্ঠীর লেখকেরা ছিলেন ভাবাবেগ ও রোমান্সের সঙ্গী। সেখানকার বাস্তবতার ঘরে ফাঁকি ছিল বড়। সেজন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল, কালি-কলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের মধ্যে ছিল না"।[৭] তাছাড়া আধুনিক সভ্যতার আড়ালে যে মানুষের আদিম যৌন প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে—যা সমগ্র জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যেটি "ফ্রয়েডীয়ান তত্ত্ব" নামে খ্যাত, তাকে আশ্রয় করেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্টি করেছেন 'প্রাগৈতিহাসিক'। এখানে ভিখু ও পাঁচী সরীসৃপের মতই আদিম প্রবৃত্তির বশে বন্দী। তারাশঙ্করের 'সাপুড়ের গল্প', 'বেদের মেয়ে' প্রভৃতি এই পর্যায়ের অন্তর্গত যা সমাজতত্ত্বের নিরিখে মূল্যবান।

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও মূল্যবোধের পরিবর্তনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশেষ ভূমিকা স্মরণীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ এক বিপর্যস্ত মূল্যহীন অন্ধকারে প্রবেশ করেছে যেখানে ন্যায়, নীতি, ধর্ম,

নারীত্ব, মর্যাদা, মনুষ্যত্ব সবই মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং অর্থই কেবলমাত্র জীবনের মুখ্যস্থান অধিকার করেছে। শ্রেণীসংগ্রাম হয়েছে প্রকট। এইসব সুস্পষ্টভাবে সাহিত্যের রাজ্যেও এসেছে। প্রগতিবাদী লেখকগণ দায়িত্বের সঙ্গে তা পালন করতে এগিয়ে আসেন। এই পর্বের লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে মার্কসীয় নীতির উপর নির্ভর করে মধ্যবিত্তের সুযোগ সন্ধানী মুখোশ উন্মোচন করেন। ফলে "মধ্যবিত্তের জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে আমাদের সমস্ত মোহভঙ্গ হয়ে যায়। সমস্ত কৃত্রিমতার মুখোশ যেন খুলে পড়ে এবং নগ্ন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা কিছুটা শিহরিত হয়ে উঠি।"(৮) অবশ্য মানিকের অনেক পূর্বেই প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী তারাশঙ্কর সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ করেন। তাঁর লেখনী শুধু বর্তমান নয়, যেন অতীত ও ভবিষ্যতের 'রাণার'। জীবন-দর্শন-ধর্ম-ঐতিহ্য-ফ্রয়েডীয়ান তত্ত্ব, মার্কসীয় ধারণা—ইত্যাদি সবই তাঁর লেখায় আছে। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ মিত্র বলেছেন, "লেখকের লেখার মধ্যে ফ্রয়েড এবং মার্কসের প্রসঙ্গ যেমন আছে, ঠিক তেমনি জমিদারী কাজের কথা, শাক্ত—বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখ, এদেশের গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের এবং আরো আগেকার তথাকথিত এই 'আধুনিক' যুগের নানা ঘটনার উল্লেখ আছে।" (৯) এ প্রসঙ্গে পূর্ণেন্দুবাবুর মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন, "জমিদারী কাজে এবং বিভিন্ন জনহিতকর কাজে তারাশঙ্কর গ্রামীণ মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং কাছ থেকে দেখা এই জীবন প্রবাহকে তিনি তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম দু'দশকে নানা উপন্যাস ও গল্পে আন্তরিক নিষ্ঠায় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।" (১০) তারাশঙ্করের "শ্মশানের পথে" গল্পে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সুপার স্ট্রাকচার অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে উপস্থাপিত। এখানে জমিদারের চাপরাশী, সুদখোর মহাজন, কাবুলীওয়ালা, হৃদয়হীন কবিরাজ—এযুগের সকলেই আছে। তারাশঙ্কর বলেছেন, "কম্যুনিজম যে তত্ত্ব বলে— সকল মানুষের সমান অধিকার সব মানুষ সম-মর্যাদার অধিকারী, যে তত্ত্বের মধ্যে কল্পনা এক স্বর্গরাজ্যের যে রাজ্যে অন্নে-বস্ত্রে-শিক্ষায়-স্বাস্থ্য-সুখে এক স্বর্গ রাজ্যের, যে রাজ্যের মধ্যে অনাচার নেই, পীড়ন নেই, শাসকের রক্তচক্ষু নেই, ভয় নেই, যে রাজ্য-অভয়ের রাজ্য সেই কম্যুনিজমের প্রতি ১৯১৮ সালের পর থেকে অন্ততঃ বিশ বছর ধরে প্রায় প্রতিটি লেখকই আকৃষ্ট হয়েছেন।"(১১) কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কম্যুনিষ্টদের পথ থেকে সরে দাঁড়ান। হয়তো পরবর্তী কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ নিজকক্ষে সংযত ছিলেন না কিংবা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিলেন। এপ্রসঙ্গে লেখক স্বয়ং তাঁর 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধে বলেছেন, "কম্যুনিষ্টের স্বর্গরাজ্যে কম্যুনিষ্ট দলের একাধিপত্য। সেখানে ব্যক্তি নেই, আত্মা নেই, ঈশ্বর নেই, অমৃত নেই। আছে, আত্মাহীন প্রাণ। আছে মৃত্যু, আছে হিংসা, আছে কৌশল, তাতেই বিশ্বাস ও আনুগত্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি অন্ন-বস্ত্র-বস্তু জ্ঞানের। তাতে অবিশ্বাস আনুগত্যে আছে দণ্ড-বন্ধন-মৃত্যু।" (১২)

তারাশঙ্কর সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং পার্টির কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। সে জন্যে তিনি বিজয়বাবু (মন্বন্তর), ধীরানন্দ (সন্দীপন পাঠশালা), সঞ্জীব (প্রেম ও প্রয়োজন), এর মত গান্ধীবাদী ও মার্কসবাদী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তিনি মার্কসবাদ পড়েননি। যদি পড়তেন তাহলে হয়তো বাংলা সাহিত্যে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারতেন। ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করে তিনি সাম্যবাদ চাননি। "বঙ্গভঙ্গ"কে নিয়ে তেমন কোন কালজয়ী সাহিত্য কীর্তি রচিত হয়নি। যে কাজটা পারতেন একমাত্র তারাশঙ্করই। এ প্রসঙ্গে শকুন্তলা ভট্টাচার্য বলেছেন, "একাজটাও পারতেন বোধহয় একমাত্র তারাশঙ্করই; যদি তিনি পূর্ববাংলার লোক হতেন। কারণ শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবী বিশ্লেষণ আর মার্কসবাদের যান্ত্রিক প্রয়োগ এত গুরুভার বিষয়কে যে যথেষ্ট রসোত্তীর্ণ করতে পারে না তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সার্বজনীন", আর মার্কসবাদ ছাড়া শুধুমাত্র কাব্যিক ভাবাবেগ ও নষ্টালজিয়াও যে বিষয়টিকে ওৎরাতে পারে না তার প্রমাণ সমরেশ বসুর বিস্মৃত প্রায় উপন্যাস "হারায়ে সেই মানুষে"। তারাশঙ্করের দুর্বার আবেগ শক্তিশালী মাটির টান আর মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসার সঙ্গে যদি মার্কসবাদের কংক্রীটের ভিত যুক্ত হোত তো এই বঙ্গভঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে মহাকাব্যের মত উপন্যাস রচিত হতে পারত।" (১৩)

কথা সাহিত্যে তারাশঙ্কর যেমন ক্লাসিক শিল্পী, তেমনি বিচিত্র অপরূপ ছোটগল্পেরও তিনি স্রষ্টা; এজগতে তিনি নন্দিত। সমাজ ও সমাজ জীবনের বিচিত্ররূপ তাঁর সৃষ্টিতে অপরূপতায় বিধৃত। সমাজ (বিশেষতঃ বাঙালীসমাজ), তার জীবন ও অন্তর্গত চরিত্রাবলী তাঁর সৃষ্টিতে যেমন বিচিত্রভাবে স্থান পেয়েছে, তা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত।

তবে কথাসাহিত্যে সমাজতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে, "পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে প্রকাশ্য ও গোপন সম্পর্ক আবিষ্কারে, তার ঘোষিত ও অঘোষিত অভিপ্রায় চিনে নেওয়ায় সাহায্য" (১৪) করে । কিন্তু তার ক্যানভাস ও সুযোগ ব্যাপক বলে তার রূপ সুস্পষ্ট। অন্যদিকে ছোটগল্পের রূপ ও স্বরূপে এই সুযোগ ও সময় একেবারেই সীমিত। তবুও ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ ছোটগল্প বোধ করি অধিকতর হৃদয়গ্রাহী এবং তা সাহিত্যাস্বাদীও বটে।

তারাশঙ্করের গল্পের আন্তরধর্মের বাস্তবতা ও তার স্বরূপ নির্ধারণ সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণে সম্ভব বলেই আমাদের ধারণা। এবং বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তার হয় যথার্থ আবিষ্কার। আমাদের বক্ষ্যমান আলোচনা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া প্রসূত বিচিত্র সমস্যা, জীবন-জীবিকা ও তার শ্রেণীবিন্যাস, শ্রেণীসংঘাত এবং গল্প-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের স্বরূপ নির্ধারণই আমাদের সাধ্য। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই সূত্রেরই আছে বিচার-বিশ্লেষণ।

পাদটীকা

(১) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় :	কালের পুত্তলিকা	পৃঃ - ৭
(২) Mac Iver & Page :	Society	Ch 22- P-511
(৩) প্রাগুক্ত :		P -5
(৪) Giddings :	Principles of Sociology	P. 5
(৫) ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত :	রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব	পৃঃ - ৩
(৬) প্রাগুক্ত :	রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব	পৃঃ - ৩
(৭) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় :	লেখকের কথা	পৃঃ - ২২
(৮) বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য :	ছোটগল্পে ত্রয়ী	পৃঃ - ২৯
(৯) হরপ্রসাদ মিত্র :	তারাশঙ্কর	পৃঃ - ৮৪
(১০) পূর্ণেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় :	মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে তারাশঙ্করের উপন্যাস	পৃঃ - ১৪
(১১) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় :	বীথিকা (শিল্পীর স্বাধীনতা)	পৃঃ - ২৮৯
(১২) প্রাগুক্ত :	বীথিকা (শিল্পীর স্বাধীনতা)	পৃঃ - ২৯১
(১৩) শকুন্তলা ভট্টাচার্য :	বাংলা সাহিত্যের তিন বাঁড়ুজ্যে ('সমন্বয়' শারদ সংখ্যা '৯৫)	পৃঃ - ২০
(১৪) ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত :	রবীন্দ্রনাথ : - ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব	পৃঃ - ১৩